নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা ৯৫-১০৬
©২০০৬ নৃবিজ্ঞান বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালযয়, ঢাকা

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে লিঙ্গীয় ও শ্রেণী সর্ম্পকের ব্যবহার এবং পুনরুৎপাদন

মোসাঃ শাহীনা পারভীন*

ভূমিকা

বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক লেখালেখির মূল লক্ষ্য থাকে কি কারণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ফলপ্রসূ হচ্ছে বা হচ্ছে না, তা উল্লেখ করা। লেখাগুলোতে এই কার্যক্রম ফলপ্রসূ করার উপায় অনুসন্ধান করা হয় বা বলে দেয়া হয়। এই সমস্ত লেখালেখি পর্যবেক্ষণ করলে যে বিষয়ে মিল লক্ষ্য করা যায় তা হলো : দরিদ্র নারীরা অধিক সন্তান জন্ম দেয়, তারা অশিক্ষিত, তাদের জ্ঞান বুদ্ধি কম বা সচেতনতা নেই। যেমন আহমেদ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সর্ম্পকিত লেখায় বলেছেন, বাংলাদেশের নারীদের উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ তাদের আর্থসামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। গরিব নারীদের উর্বরতা বেশী কারণ তাদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়। এছাড়া স্বামী স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান অনেক বেশী হওয়ায় তাদের মধ্যে গর্ভনিরোধক ব্যবহারের আলাপ গড়ে ওঠে না, ইত্যাদি (আহমেদ, ১৯৯১)। লেখাসমূহে শ্রেণীভেদে নারীর উর্বরতা কম বা বেশী কেন হয়, তার কারণসমূহ উল্লেখ করা হয় এবং নারীকে গর্ভনিরোধক ব্যবহারকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু গর্ভনিরোধক ব্যবহারকারী হিসেবে নারীর অভিজ্ঞতা ও শ্রেণীভেদে যে গর্ভনিরোধক ব্যবহারকারী নারীর অভিজ্ঞতা ভিন্ন হয়, তা আলোচিত হয় না। লেখালেখিসমূহে যেমন লিঙ্গীয় ও শ্রেণী বিভক্তি টেনে এনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দায়ভার গরিব নারীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, তেমনই রাষ্ট্র বা সরকারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমেও একই বিষয় পরিলক্ষিত হয়। সরকারের কার্যক্রমও গরিব ও ধনী নারীদের সামাজিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে তৈরী, যা কিনা লিঙ্গীয় ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজকেই পুনরুৎপাদিত করে। এই বিভক্তি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও ক্রিয়াশীল ।

বিশ্বে জনসংখ্যা শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথেই 'তৃতীয় বিশ্বকে' জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী করা হয় এবং এই জন্য আন্তর্জাতিকভাবে জনসংখ্যা হ্রাসের

---

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
ই-মেইল Shahinamoni@yahoo.com.

পদক্ষেপ নেয়া হয়, যা রাষ্ট্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। বিশ্বে জনসংখ্যা হ্রাসই যদি মূল লক্ষ্য হয়, তাহলে 'তৃতীয় বিশ্ব' প্রথম বিশ্বের' নারী বা ধনী ও দরিদ্র নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা থাকার কথা নয় বা তাদের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েও যাওয়ার কথা না। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই ভিন্নতাটা স্পষ্ট হয়। যখন 'তৃতীয় বিশ্বের' জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে দাতা সংস্থাসমূহ এত উদ্যোগ গ্রহণ করে, তখন আবার প্রথম বিশ্বের' জনসংখ্যা যাতে বৃদ্ধি পায় তারও ব্যবস্থা নেয়া হয় (আখতার, ১৯৯৯)। এই বিষয়গুলো ভাবনার উদ্রেক করে। এই ভাবনা নিয়েই আমার এই লেখা[১]। লেখাটিতে ভিন্ন দুটি শ্রেণী মধ্যবিত্ত ও নিম্নবর্গীয়[২] নারীর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বলবার চেষ্টা করা হবে যে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে যে বৈষম্য ক্রিয়াশীল, তা কিভাবে রাষ্ট্রের মাধ্যমে 'তৃতীয় বিশ্বের' অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হয় এবং সমাজে বিদ্যমান কিভাবে লিঙ্গীয় ও শ্রেণীবিভক্ত ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যমান ব্যবস্থাকে পুনরুৎপাদন করা হয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

বিশ্বে দুইটি অংশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ধারণা দুই রকম। একটি ওভার পপুলেশন ও অন্যটি আন্ডার পপুলেশন। 'উন্নত' দেশগুলো কম জনসংখ্যা ও 'অনুন্নত' দেশগুলোকে অধিক জনসংখ্যার দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ধনীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে নয় বরং দরিদ্রদের সন্তান বৃদ্ধির সাথে যুক্ত করা হয়। দরিদ্রদের সন্তান সংখ্যা কমানোর জন্য আন্তর্জাতিকভাবে গৃহিত পলিসি বাস্তবায়ন করা হয় রাষ্ট্রীয় পলিসির মাধ্যমে (রান্ডেরিয়া, ১৯৯৮)। রাষ্ট্রীয় পলিসিগুলো বিদ্যমান লিঙ্গীয় ও শ্রেণী মতাদর্শ কাজে লাগায়। উনিশ শতকে আধুনিক গর্ভনিরোধক পদ্ধতি আবিস্কারের পর রাষ্ট্র সামাজিক মতাদর্শ ব্যবহার করে অর্থাৎ গর্ভনিরোধক ব্যবহার নারীর পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা হয়। এই সময় গর্ভনিরোধক ব্যবহারকে নারীর সামাজিক মর্যাদার সাথেও যুক্ত করা হয় (হুড ও অন্যান্য, ১৯৮১)। আবার রাষ্ট্রীয় পলিসিতে দম্পতিদের সন্তান কম নেয়ার ব্যাপারে চাপ থাকলেও এই দায়িত্ব কেবলমাত্র নারীদের উপরই বর্তায় বলে ধরে নেওয়া হয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে পুরুষদের অর্ন্তভূক্ত করার চেষ্টা করা হলেও এটি নিয়ে উদ্ভূত চাপের সম্ভাবনাকে পাশ কাটানো হয়। ভারতে ১৯৭০ সালে প্রথম পুরুষদের জন্য বন্ধ্যাকরণ কর্মসূচী নেয়া হলে এ নিয়ে ব্যাপক বির্তক তৈরী হয়। বিতর্কের তোপে কংগ্রেস সরকার এই কর্মসূচী বাতিল করে (ইউভাল, ১৯৯৭)। এ থেকে বোঝা যায় যে, রাজনৈতিকভাবে সামাজিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শক্তিশালী পুরুষকে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না। সমাজে বিদ্যমান যে অসম ব্যবস্থা, তাকে ব্যবহারের মাধ্যমেই এই কার্যক্রম ফলপ্রসূ হতে পারে। তাই নারীকে বেছে নেয়া হয়।

তবে নারীসত্তাও শ্রেণীবিভক্ত (ইসলাম ও সুলতানা, ২০০২)। ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে নারীসত্তার বিভক্তিকে বিবেচনায় রেখে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা তৈরী করা হয়। সমাজে নিম্নবর্গীয় নারী রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে বেশী অধঃস্তন হওয়ায় নিম্নবর্গীয় নারীদের জন্য বিশেষ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। তাদের সবসময় স্থায়ী গর্ভনিরোধকগুলো ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য টাকা দেয়া হয়, কখনও দমনমূলকভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়। 'তৃতীয় বিশ্বের' জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যখন এত কৌশল অবলম্বন করা হয়, তখন ভিন্ন চিত্রও দেখা যায়। ধনীদেশের নারীরা যাতে অধিক সন্তান নেয় তার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করার পাশাপাশি তাদের টাকা দিয়ে বেশী সন্তান নেয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়। অর্থাৎ গরিব দেশের গরিব নারীদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে স্থায়ীভাবে অনুর্বর করার জন্য টাকা দিয়ে উৎসাহিত করা হলেও ধনী দেশের নারীরা যাতে সন্তান জন্মদানে উৎসাহিত হয়, তার জন্য টাকা দেয়া হয়। যার মধ্য দিয়ে বর্ণবাদী ধারণা স্পষ্ট হয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী সুস্পষ্টভাবে বর্ণবাদী চিন্তা ভাবনা ও শ্রেণীভীতি থেকে শুরু হয়েছে। কারণ 'প্রথম বিশ্বের' জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সমস্যা হিসেবে দেখা হয় না, 'তৃতীয় বিশ্বের' জনসংখ্যাই সমস্যা। ধনীদেশগুলো জানে যে, গরিব দেশগুলোর সম্পদ ব্যবহার করেই তারা ধনী হয়েছে এবং অধিক ভোগ করতে পারছে। তাই গরিব দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে (আখতার, ১৯৯৯)।

একই ধরনের বৈষম্যমূলক মনোভাব আমার গবেষণা এলাকায় লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৯৯ সালের জনসংখ্যা দিবসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জয়পুরহাট জেলার একজন সংসদ সদস্য তার বক্তব্যে বলেন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে দরিদ্র নারীদের টার্গেট করা উচিত। কারণ তাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর ধনীদের সংখ্যা কমছে। তাদের সংখ্যা কমাতে না পারলে ভবিষ্যতে আমরা তাদের দ্বারা পরিচালিত হবো এবং দেশে অরাজকতা বৃদ্ধি পাবে। তাই তাদের সংখ্যা কমানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার মাধ্যমে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, এই জন্য নারী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের সংখ্যা কমানো সম্ভব। এইক্ষেত্রে মাঠকর্মীদের বড় দায়িত্ব রয়েছে। তারা যাতে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, সেইজন্য তাদেরও পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা থাকা উচিৎ।" এইভাবে বৈশ্বিক বৈষম্যের ডিসকোর্স একেবারে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। কেইলার তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, রডেশিয়াতে আফ্রিকানদের উপর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ঔপনিবেশিক প্রকল্পের সাথে জড়িত। রডেশিয়া আফ্রিকানদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ফলপ্রসূ করার জন্য দমনমূলক কৌশল প্রয়োগের পাশাপাশি মিশনারী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সুকৌশলে নারীদের মনোভাব পরিবর্তন করে গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারের হার বৃদ্ধির উপর জোর দেয় (কেইলার, ২০০০)। গবেষিত জনগোষ্ঠীর বাস্তবতাও প্রায় একই।

সরকার গরিব নারীদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যেমন দমনমূলক বন্ধ্যাকরণ চালু রেখেছে, তেমনই সেটির নিরপেক্ষ চেহারা দেয়ার জন্য টাকা প্রদান করে। টাকা প্রদানের বিষয়টি বুঝিয়ে দেয় যে, ব্যবস্থাটি শ্রেণীভিত্তিক। কারণ সরকার গরিব নারীর দৈনন্দিন বাস্তবতা অর্থাৎ অভাব, অনটন সর্ম্পকে জানে। তাই টাকা প্রদানের লোভ দেখিয়ে বিশেষ কিছু পদ্ধতি গ্রহণের জন্য গরিব নারীদেরই উৎসাহিত করে। আবার সরকারের বিভিন্ন প্রচারণা সাধারণ মানুষের বোধ বুদ্ধিতে স্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়। যেমন "অধিক জনসংখ্যা পরিবারের উন্নতির প্রধান অন্তরায়, তাই জন্মনিয়ন্ত্রণ করে ছোট পরিবার গঠন করে এই বাধা দুর করা সম্ভব।" -এই প্রচারণা নারীদের বোধবুদ্ধিতে স্থাপিত হয়েছে। নারীরা তাই নানাবিধ শারীরিক সমস্যা মেনে নিয়েও জন্মনিয়ন্ত্রণে নিজেদের আত্মনিয়োগ করেছে। রাষ্ট্রীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী শুধুমাত্র নারীদের উপর আধিপত্যই বিস্তার করেনি বরং নারীদের কাছ থেকে সম্মতি আদায়ের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রমের বৈধতাও দিয়েছে। গ্রামসীর হেজেমনি ধারণা বিষয়টি অনুধাবনে দিক নির্দেশনা দিতে পারে।

আন্তেনিও গ্রামসী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানাদি, রাজনৈতিক সমাজে যেভাবে শাসন ব্যবস্থা জারি রাখে তাকে দমন বা বলপ্রয়োগ হিসেবে চিনতে চেয়েছেন। এখানে মানুষের সম্মতি বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। শাসনের যে ব্যবস্থাদি বল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল থাকে। তাকেই আবার সম্মতি আদায়ের মধ্য দিয়ে পোক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি গ্রামসির ভাবনাতে হেজেমনি যা প্রবল শ্রেণীর আধিপত্যকে কায়েম রাখে। পশ্চিমা জ্ঞান কান্ডের দাপটকে চেনা সম্ভব এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। এইক্ষেত্রে হেজেমনি সৃষ্টির পুরা ভাগে রয়েছে খোদ শিক্ষাজাগতিক প্রতিনিধিবৃন্দ যারা প্রগতির ধারণাকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করেছেন (গ্রামসী, ১৯৯৬)। সাম্প্রতিক কালে বিশেষজ্ঞ দল যারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন। সাথে পর্যালোচনা ও উন্নয়ন কর্মী যারা উন্নয়নের ধারণাসমূহকে নিরন্তন ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন একেবারে মাঠ পর্যায়ে" (চৌধুরী ও গুলরুখ, ২০০০)। গ্রামসী যদিও সকল মানুষকে দার্শনিক হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। তবে হেজেমনি সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করে গ্রামসীর ভাষায় যারা যৌগ বুদ্ধিজীবী (organic intellectual)। আন্তর্জাতিক পরিসরে দায়িত্ব পালন করছে এমন বুদ্ধিজীবির পাশাপাশি আছে দেশীয় কেন্দ্রস্থগণ, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেন স্থানীয় পর্যায়ে যারা এই দায়িত্ব পালন করে। এদের গ্রামসী স্থানীয় বুদ্ধিজীবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। স্থানীয় বুদ্ধিজীবিদের কাজকর্মের বড় তাৎপর্য হলো এরা একেবারে প্রান্তস্থ বা নিম্নবর্গীয় মানুষজন পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের আমূল পরিবর্তন ঘটায় (গ্রামসী, ১৯৯৬)। গ্রামসী ব্যবহৃত এই প্রত্যয়টি আন্তর্জাতিক পরিসর থেকে তৃণমূল পর্যায় অর্থাৎ গবেষণা এলাকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাস্তবতা বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামসীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী

যৌগ বুদ্ধিজীবী হিসেবে যদি খৃষ্ট ধর্মীয় যাজক থমাস ম্যালথাসকে[৪] বিবেচনা করি, তাহলে তিনি জনসংখ্যা তত্ত্ব দিয়ে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনা করে যে ভীতি সৃষ্টি করেছিলেন, সেই ভীতি থেকেই যৌগবুদ্ধিজীবীরা নিরন্তন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ব্যাখ্যা তৈরী করছেন। এই ব্যাখ্যাসমূহ কেন্দ্র থেকে একেবারে যাতে প্রান্তে পৌঁছায় তার ব্যবস্থাও করছেন প্রতিনিয়ত। তারা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পলিসি তৈরী করে মাঠ পর্যায়ে নারীদের গর্ভনিরোধক ব্যবহারের মনোভাব তৈরী করার জন্য নারী মাঠকর্মী (যারা কিনা গ্রামসীর ভাষায় স্থানীয় বুদ্ধিজীবী) নিয়োগ করেছেন। মাঠকর্মীরা জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যে প্রতিটি নারীর নিজের ও তার পরিবারের কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তা প্রতিনিয়ত বুঝিয়ে যাচ্ছেন। জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নারীকেই বুঝানো হয় যে, এটি তার দায়িত্ব, কিন্তু পুরুষকে বুঝানো হয় না। এই বিষয়টি সম্পর্কে গবেষণা এলাকার একজন মাঠকর্মী বলেন, নারীরা যেহেতু ঘরে থাকে, তাই তাদের বুঝানো সহজ। নারীদের পরামর্শ দিলে মানে কিন্তু পুরুষরা মানতে চায় না। আমাদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক, তাই পুরুষরা এই দায়িত্ব নিতে চায় না, তারা নারীদের উপর চাপিয়ে দেয়। শুধু তাই না, সরকারও পুরুষদের উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে চাপ দেয় না।" নারী হওয়ার কারণেই যেমন সে এ অভিজ্ঞতা লাভ করে, তেমনই শ্রেণীগতভাবেও নারীর অভিজ্ঞতা ভিন্ন হয়। মধ্যবিত্ত নারী লিঙ্গীয় বৈষম্যের শিকার হলেও নিম্নবর্গীয় নারী একই সাথে লিঙ্গীয় ও শ্রেণীগত উভয় বৈষম্যের মধ্যে দিয়ে যায়। ফলে নারী হওয়া সত্ত্বেও নারীর দুটি ক্যাটাগরি কাজ করে এবং দুই ক্যাটাগরির নারী দুইভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রকরাও সমাজে বিদ্যমান ব্যবস্থা অনুযায়ী কর্মসূচী হাতে নেয়। তারা সকল শ্রেণীর নারীকে একইভাবে উদ্বুদ্ধ করে না। দুই শ্রেণীর নারীকে উদ্বুদ্ধ করার ধরন ভিন্ন হয়। দুই শ্রেণীর নারীর নিয়ন্ত্রণের ধরনও ভিন্ন। এভাবে দেখা গেছে যে, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে যে বৈষম্য তা গবেষণা এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই নীতিটির কারণে নারীগণ কি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়, তা আলোচনার আগে ঐতিহাসিকভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে রাষ্ট্র ও দাতা সংস্থার যোগাযোগ প্রসঙ্গে আলোচনাটি সেরে নিতে চাই।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে রাষ্ট্র ও দাতা সংস্থার যোগাযোগ

আমাদের এই অঞ্চলে প্রথম ১৯৫২ সালে বিদেশী প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানসমূহ তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান ফ্যামিলি প্ল্যানিং আসোসিয়েশন গঠনে আর্থিক সাহায্য দেয়। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ ফ্যামিলি প্ল্যানিং আসোসিয়েশন নামে পরিচিত। তখন থেকেই বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিদেশী দাতা সংস্থার হস্তক্ষেপ শুরু হয়। ১৯৬০ সালে পপুলেশন কাউন্সিল পাকিস্তান সরকারকে স্বাস্থ্য সেবার একটি নিয়মিত উপাদান হিসেবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম যুক্ত করতে বলে।

তখন গ্রামে মহিলাদের গর্ভনিরোধক ব্যবহারের মনোভাব তৈরীর জন্য অনুদান দেয়া হয়। এই সময় ফোর্ড ফাউন্ডেশনও গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা দেয়। এই গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পেও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত ছিলো। ১৯৬৫ সালে প্রথম পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মী গ্রামের মানুষের কাছে আসে এবং তাদের জীবনের অংশে পরিণত হয়। জনগণ ভাবে, এটি তাদের আর্দশ, প্রথার জন্য হুমকী স্বরূপ কিন্তু এটি বন্ধ করার মতো ক্ষমতা তাদের ছিলো না। তাই তারা এটি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলো। এইসময় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীতে আই ইউ ডি ও বন্ধ্যাকরণ যুক্ত করা হলেও গ্রামের মানুষকে একেবারেই খাবার বড়ি দেয়া হতো না। কারণ তারা জানত যে, খাবার বড়ি সরবরাহ করলে আই ইউ ডি ব্যবহারের হার হ্রাস পেতে পারে। আই ইউ ডি প্রয়োগ করা তাদের জন্য গুরত্বপূর্ণ ছিলো এই কারণে যে, আই ইউ ডি পাঁচ বছর মেয়াদী হওয়ায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রকরা এটি প্রয়োগ করে গ্রামের নারীদের পাঁচ বছর ধরে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। এই সমস্ত দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী পদ্ধতি যাতে নারীরা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয় ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যরত কর্মীরাও যাতে নারীদের এগুলো প্রদানের ব্যাপারে উৎসাহী হয়, তার জন্য আই ইউ ডি ও বন্ধ্যাকরণ গ্রহণ ও প্রদানকারী উভয়কেই টাকা দেয়া হতো। ১৯৭০ সালের পর আমেরিকা এ দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সবচেয়ে বেশী অনুদান দিতে শুরু করে। এই সময় প্রথম বারের মতো খাবার বড়ি প্রদান করা হয়। এই খাবার বড়িগুলো আমেরিকার বহুজাতিক কোম্পানীর উৎপাদিত। ফলে খাবার বড়ি সরবরাহ এই কোম্পানীগুলোর জন্য ছিলো লাভজনক। এতদিন জাতিসংঘ ও ইউ এস এ আই ডি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও ১৯৭৪ সালে এই জায়গা দখল করে ইউনাইটেড নেশনস্ ফান্ড ফর পপুলেশন অ্যাকটিভিটিস সংক্ষেপে ইউ এন এফ পি এ। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দাতা সংস্থার নির্দেশে বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য সেবার সকল সেক্টরে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সংযুক্ত করে (আখতার, ১৯৯২)। রাভেরিয়া বলেন, ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে দাতা সংস্থাসমূহ যত অর্থসাহায্য দেয়, তা আর অন্য কোন খাতে দেয়া হয়নি। ভারতে ১৯৫১ সালে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ১.৪ মিলিয়ন রুপী বরাদ্দ হয়, ১৯৯১-৯২ সালে এই বরাদ্দের পরিমান বেড়ে ১০.৭১ বিলিয়ন রুপীতে দাড়ায়। সরকার দাতা সংস্থার নির্দেশ মোতাবেক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ফলপ্রসু করতে যত পলিসি তৈরী করেছে, অন্য কোন ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ভারতে ১৯৫১ সালে শুধুমাত্র কনডম বিতরণ করা হতো। ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘ জনসংখ্যা কমিশনের নির্দেশে নারীদের দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি আই ইউ ডি দেয়া হয়। পরবর্তীতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী দমনমূলক বন্ধ্যাকরণে রূপান্তরিত হয় (রাভেরিয়া, ১৯৯৮)।

বিশ্ব ব্যাংক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ফলপ্রসু করতে ১৯৮০ সালে উন্নয়নে নারীকে যুক্ত করার উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্বারোপ করে। এইজন্য ইউনিয়ন

পর্যায়ে ৭৬০টি মাদার ক্লাব গঠন করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক আর্থিক সাহায্য দেয়। এই সমস্ত ক্লাবের উদ্দেশ্য ছিলো, নারীদের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে অর্ন্তভুক্ত করা। '৮০-র দশকের পর থেকে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শুরু করে দাতা সংস্থার অর্থসাহায্যে। ফলে এই সকল প্রতিষ্ঠানও দাতাসংস্থার পলিসি বাস্তবায়নে কাজ করে এবং এখন পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা চলছে। দাতা সংস্থাসমূহ যখন যে গর্ভনিরোধকগুলো নারীদের সরবরাহ করতে নির্দেশ দেয়, এই সকল বেসরকারী ও সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নারীদের মাঝে সেই গর্ভনিরোধক পদ্ধতিগুলো সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে (আখতার, ২০০১)। তবে এর মধ্যে বিভক্তি রয়েছে। মধ্যবিত্ত নারীরা যখন বিভিন্ন ব্র্যান্ড পরিবর্তন করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে মুনাফা তৈরীতে সহায়তা করে তখন নিম্নবর্গীয় নারীরা পদ্ধতি বাজারজাত করার পূর্বে সেগুলো মানবদেহে প্রয়োগযোগ্য কিনা তার ট্রায়ালের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন নরপ্ল্যান্ট। যদিও এই পদ্ধতি পরবর্তীতে তাদের জন্যই বরাদ্দ হয়। যেমন গবেষিত এলাকার কোন মধ্যবিত্ত নারী এই পদ্ধতি ব্যবহার করেনি। তাদের কাছে এই পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধাসমূহ বলার জন্য কোন মাঠকর্মীও যায়নি। আরো একটি বিষয় উল্লেখ করলে বোঝা যায় যে, এটি নিম্নবর্গীয় নারীদের জন্যই পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেটি হলো, এই পদ্ধতিটি ৫বছর মেয়াদী এবং পদ্ধতিটি প্রয়োগের সময় থেকে ৫ বছর পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময় পর পর টাকা দেয়া হয় ।

এই পদ্ধতিটি প্রয়োগের জন্য নিম্নবর্গীয় নারীদের নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করা হলেও নারীরা যখন শারীরিক সমস্যায় ভুগতে থাকে তখন তাদের শারীরিক যন্ত্রণাকে আমলেই আনা হয় না, তারা পদ্ধতিটি খুলতে চাইলে খুলে দেয়া হয় না। শুধু তাই না, অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে নারীরা সমস্যায় ভুগলে সে ব্যাপারেও কোন পদক্ষেপ নেয়া হয় না। কিন্তু কেন সরকার এগুলো আমলে আনে না। কারণ সরকারের কাছে নারীর শারীরিক কষ্টের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ধনীদেশের বহুজাতিক কোম্পানীর তৈরী পদ্ধতিগুলোর বাজারজাত করা ও নির্দিষ্ট সাল নাগাদ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তাদের বেঁধে দেয়া টার্গেট পুরণ করা। দাতা সংস্থাসমূহ এর ভিত্তিতেই সরকারকে অনুদান দেয়। দাতা সংস্থাসমূহ গরিব দেশের চেয়ে ধনী দেশের স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে লক্ষ্য রেখেই পলিসিগুলো তৈরী করে। সরকারও আর্থিক সাহায্য পাবার শর্ত হিসেবে এগুলো খারাপ হোক, ভালো হোক নারীদেহে প্রয়োগ করে বা তাদের নির্দেশ মোতাবেক পলিসি তৈরী ও বাস্তবায়ন করে। বাস্তবায়নের জন্য দমনমূলক উপায়ও বেছে নিতে প্রতিষ্ঠানসমূহ পিছ পা হয় না (আখতার, ১৯৯৯)। গবেষণা এলাকায় বি এ ভি এস নামক একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট হার পূরণের লক্ষ্যে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা নারীদের নানাভাবে বন্ধ্যাকরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এইজন্য তারা নারীর বয়স, শারীরিক অবস্থাসমূহ তো বিবেচনা করেই না, সরকার প্রদত্ত নিয়মাবলী যে, দু'য়ের অধিক সন্তানের মাকেই শুধু বন্ধ্যাকরণ করা যাবে,

তাও উপেক্ষা করে। হার পূরণ করতে উর্বরতা নেই এমন নারীকেও বন্ধ্যাকরণ করা হয়। এমনকি ১৪ বছরের একটি মেয়েকে ব্রণের ঔষুধ হিসেবে বন্ধ্যাকরণ করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে লিঙ্গীয় ও শ্রেণীগতভাবে নারীর অভিজ্ঞতা

"বর্ণ, শ্রেণী, যৌনতার ক্ষমতা কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত নারীদের মধ্যে পার্থক্যসমূহ নারীর অভিজ্ঞতার জটিল প্রকরণ তৈরী করে" (ইসলাম ও সুলতানা, ২০০৬, অপ্রকাশিত)। সরকারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম লিঙ্গীয় ও শ্রেণী ভিত্তিতে তৈরী হয়, তাই নারীরাও ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সবসময় নারী, বিশেষত গরিব নারীদের টার্গেট করা হয়। এই জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করা হয়। যেমন সবসময় দীর্ঘমেয়াদী গর্ভনিরোধক পদ্ধতিসমূহ তাদের সামনে হাজির করা হয়, স্বল্পমেয়াদী পদ্ধতিগুলো সর্ম্পকে বলা হলেও এগুলো যে তাদের জন্য উপযুক্ত না, তার স্বপক্ষে নানা যুক্তি দেখানো হয়। গবেষণা এলাকার একজন মাঠকর্মী বলেছেন, "দরিদ্র নারীদের সবসময় দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করা হয় কারণ তারা প্রতিদিন খাবার বড়ি খেতে ভুলে যায়, প্রতি তিনমাস অন্তর তারিখ মনে রেখে ইনজেকশন (ডিপো প্রভেরা) নেয়া তাদের জন্য সমস্যা। এই বিষয়গুলোই তাদের বুঝানো হয়। তাদের বুঝানো সহজ কারণ তারা আমাদের কথার দাম দেয়।"

গরিব নারীরা যাতে এই সমস্ত পদ্ধতি নিতে উৎসাহিত হয় সেইজন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা কাজে লাগানো হয়। বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ফলপ্রসূ করতে সরকার ১৯৮৩ সালে গরিব মানুষকে রিলিফ দেয়ার শর্ত হিসেবে নারীকে বন্ধ্যাকরণ করত। এখনও গরিব জনগণকে বন্ধ্যাকরণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য টাকা দেয় হয়। এমনকি বন্ধ্যাকরণের হার বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য পদ্ধতি সর্ম্পকে জানানো হয় না। সরকার গাইড লাইনে নির্দেশ আছে যে, তিনের কম সন্তান সংখ্যা হলে সেই নারীদের যেন বন্ধ্যাকরণ করা না হয়। কিন্তু ১০শতাংশ নারীকে এক বা দুই সন্তান জন্ম দেয়ার পর বন্ধ্যাকরণ করা হয়েছে। আবার কিছু নারীকে বন্ধ্যাকরণ করা হয়েছে যাদের কোন সন্তান নেই (হার্টম্যান, ১৯৮৭)। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত নারীদের কাছে বিশেষ ধরনের কোন একটি পদ্ধতি হাজির করা হয় না। তারা নিজেদের পছন্দমতো পদ্ধতি ব্যবহার করে। এ ব্যাপারে একজন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা বলেন, "শিক্ষিত ও ধনী নারীরা সচেতন, তাই তাদের দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয় না। অবশ্য এদের কাছে যাওয়াও সহজ না এবং এদের বোঝানোও কঠিন।" এই সামাজিক ব্যবস্থায় মাঠকর্মীরা যে মধ্যবিত্ত নারীর কাছে তেমন গ্রহণযোগ্যতা পায় না তাই তাদের উদ্বুদ্ধ করা হয় না বা এ ব্যাপারে সরকারের কোন চাপ নেই। ব্যবস্থাটি যে অসম তা পদ্ধতি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে

প্রকাশ পায়। গবেষণা এলাকায় নিম্নবর্গীয় অনেক নারী স্থায়ীভাবে গর্ভনিরোধ করার জন্য লাইগেশন করলেও মধ্যবিত্ত কোন নারী লাইগেশন করেনি। এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কার্যক্রমেও নারীদের মধ্যে বিভক্তি করা হয়।

আবার অর্থনৈতিক কারণেও দুইটি শ্রেণীর নারীর গর্ভনিরোধক ব্যবহারে ভিন্নতা রয়েছে। গরিব নারীরা খাবার বড়ি ব্যবহার করে শারীরিক সমস্যায় ভুগলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীদের মতো বাজার থেকে স্বল্পমাত্রার খাবার বড়ি কিনে খেতে পারেনা। বড়·জোর তারা সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত অন্য গর্ভনিরোধক অনুসন্ধান করতে থাকে যা কিনা তাদের শরীরে স্বস্তি ফিরিয়ে আনবে। আর এই সুযোগটি হাতছাড়া করে না জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ব্যক্তিসমূহ। গবেষণা এলাকায় দেখা গেছে, অধিকাংশ নিম্নবর্গীয় তথ্যদাতা যখন দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি ব্যবহার করছেন তখন মধ্যবিত্ত প্রায় সকল তথ্যদাতা বলেছেন, তারা খাবার বড়ি ব্যবহার করেন।

নিম্নবর্গীয় নারীরা যে খাবার বড়ি ব্যবহার করেননি তা না বরং অনেক নারীর শুরুটা হয়েছিলো খাবার বড়ি 'মায়া' দিয়ে। শারীরিক সমস্যাই তাদের এই পদ্ধতি ছাড়তে বাধ্য করেছে। আবাব অনেকে মাঠকর্মীদের পরামর্শ শুনে এটি বাদ দিয়ে অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। তবে দুই শ্রেণীর নারীদের মাঝে একটি মিলের জায়গা হলো, গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহার করে সবাই কমবেশী শারীরিক যন্ত্রণায় ভুগেছেন। যেমন মাথা ঘুরানো, বমি, চোখে কম দেখা, মাসিকের অনিয়ম ইত্যাদি। তবে দুই শ্রেণীর নারীরা এই সমস্যাগুলো থেকে পরিত্রানের উপায় খুঁজেছেন ভিন্নভাবে। মধ্যবিত্ত নারীরা ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হলেও নিম্নবর্গীয় নারী মাঠকর্মীর কাছে সমস্যার সমাধান চেয়েছেন। অনেকে মাঠকর্মীর পরামর্শমতো কাজ করে ফল না পাওয়ায় অনেক শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করেও গর্ভনিরোধক ব্যবহার করে নিজেকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রাখতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ মাঠকর্মীরা তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, তাদের দরিদ্রতার অন্যতম কারণ হলো তাদের পূর্বপুরুষের এবং তাদের সন্তান সংখ্যা বেশী। শ্রেণীগতভাবে নারীর অভিজ্ঞতা ভিন্ন হয় ঠিকই তবে কেবলমাত্র নারীরাই এই অভিজ্ঞতা লাভ করে। এ ব্যাপারে পুরুষের অভিজ্ঞতা হয় না বললেই চলে। গবেষণা এলাকার কোন তথ্যদাতার স্বামী গর্ভনিরোধক ব্যবহার করে না। তথ্যদাতারা অবশ্য চায় না তাদের স্বামী এই দায়িত্ব পালন করুক। তাদের মতে, "স্বামীরা আয় উপার্জন করে, বাইরে কাজ করে। আমরা তো ঘরে থাকি, তাদের মতো তেমন ভারী কাজ করি না।" বা "এটা তো মেয়েদেরই দায়িত্ব, পুরুষ কেন ব্যবহার করবে?"। সামাজিক মতাদর্শ নারীদের এভাবে ভাবতে শেখায়। মতাদর্শিকভাবে নারীর কাজ হালকা এবং পুরুষের কাজ ভারী হিসেবে দেখা হয়। নারী ধান ভাঙ্গুক বা মটকা বহন করুক না কেন তার কাজ হালকা হিসেবে

বিবেচিত হয়, তাই নারীরই এই শারীরিক ঝুঁকি নেওয়া উচিৎ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রকরা সামাজিক এ মতাদর্শ ব্যবহার করে ও মতাদর্শকে পুনরুৎপাদন করে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থার পুনরুৎপাদন

এই প্রবন্ধে শ্রেণীভেদে গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারে নারীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে অনুসন্ধানে যেটি পাওয়া যায় তাহলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের কারণে দুই শ্রেণীর নারী দুই রকম অভিজ্ঞতা লাভ করে। বৈশ্বিক পর্যায়ে 'প্রথম বিশ্বের' নারীর সাথে যেমন 'তৃতীয় বিশ্বের' নারীর গর্ভনিরোধক ব্যবহার ও অভিজ্ঞতার পার্থক্য রয়েছে, তেমন 'তৃতীয় বিশ্বের' ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নারীর অভিজ্ঞতাও ভিন্ন। যখন 'প্রথম বিশ্বের' নারীদের জন্য প্রস্তুতকৃত গর্ভনিরোধকগুলোর ক্ষতিকর দিকগুলো প্রমাণিত হওয়ার পর সেগুলো তাদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, তখন দাতা সংস্থার নির্দেশে এই ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ গর্ভনিরোধকগুলো রাষ্ট্রের মাধ্যমে 'তৃতীয় বিশ্বের' নারীদের জন্য সরবরাহ করা হয় (আখতার, ১৯৯৯)। আবার 'তৃতীয় বিশ্বের' মধ্যবিত্ত নারীরা যখন স্বল্পমাত্রার খাবার বড়ি ব্যবহার করে তখন নিম্নবর্গীয় নারীদের বন্ধ্যাকরণ বা দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য নানা কৌশল উদ্ভাবন করা হয়। আবার লিঙ্গীয় ভিন্নতার দিকে তাকালে দেখা যায় নারীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য নানা কৌশল নেয়া হলেও পুরুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তেমন জোরালো পদক্ষেপ নেয়া হয় না। অর্থাৎ সমাজে বিদ্যমান ব্যবস্থাকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ব্যবহার ও পুনরুৎপাদন করা হয়। শোষিতদের জন্য যে ব্যবস্থা, শোষকদের জন্য সে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। শোষক ও শোষিত এই ফারাক না রাখলে গৃহীত ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক তৈরী হতে পারে, প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে, এমনকি ব্যবস্থাপনাটি ভেঙ্গেও যেতে পারে। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতে পুরুষের জন্য বন্ধ্যাকরণের ব্যবস্থা নেয়া হলে এটি বিতর্কের মুখে বন্ধ হয়ে যায়। নারীদের গর্ভনিরোধক ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে নারী মাঠকর্মী ঘরে ঘরে যেয়ে নারীদের মনোভাব পরিবর্তন করলেও পুরুষদের মনোভাব পরিবর্তনে কোন পুরুষ মাঠকর্মী ঘরে ঘরে যাওয়ার জন্য নিয়োগ করা হয় না। এই নারী মাঠকর্মী যে সকল শ্রেণীর নারীর কাছে যেতে পারে বা বোঝাতে পারে, তা নয় । সরকার তেমনটি চায়ও না। তাদের লক্ষ্য হলো নিম্নবর্গীয় নারীকে উদ্বুদ্ধ করা। তাই টার্গেট জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতেই পলিসি গৃহীত হয়। অধস্তন নারী অধস্তন থাকে, এর সাথে অন্যান্য উপাদান যুক্ত হলে নিপীড়নের মাত্রা বাড়ে বৈ কমে না। এভাবে সামাজিক বৈষম্য কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের রাজনীতি তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত হয়। তাই ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরির নারী ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যায়। এই কারণে আমি ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা বোঝা অত্যন্ত জরুরী হিসেবে বিবেচনা করছি।

টীকা

১. প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে গবেষণার ভিত্তিতে। স্নাতক তৃতীয় বর্ষে পাঠ্যসূচীর অংশ হিসেবে জয়পুরহাট জেলার সদর থানার তিনটি পাড়ায় ১৯৯৯ সালের ১০ জুলাই থেকে ২০০০ সালের ১৩ জুলাই এর মধ্যবর্তী সময়ে গবেষণাটি সম্পন্ন করি।

২. "শ্রেণী কোন বস্তু না, এটি একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। যেটি উৎপাদন উপায়ের সাথে মানুষজনের সম্পর্ক এবং মানুষে মানুষে সম্পর্ক নির্ধারণ করে" (আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩)। নিম্নবর্গীয় শ্রেণী বুঝতে গ্রামসীর শ্রেণীর ধারণা সহায়ক হয়েছে। গ্রামসী সাবঅলটার্ন বাংলা প্রতিশব্দ নিম্নবর্গীয় বলতে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণী বুঝিয়েছেন। "সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরনের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণী শোষিত ও শাসিত হয়। তবে শুধুমাত্র পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় না, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্বেও নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর কথা বলেছেন গ্রামসী। যারা কিনা শিল্প শ্রমিক না" (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৮)। গবেষণা এলাকায় নিম্নবর্গীয় বলতে নির্দিষ্ট কোন আয়ের উৎস নেই, শ্রমশক্তি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে ও বিভিন্নভাবে শোষিত ব্যক্তিদের বুঝানো হয়েছে। লেখায় নিম্নবর্গের প্রতিশব্দ হিসেবে দরিদ্র ও গরিব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকগুলো স্তর উপস্তর রয়েছে। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী নামে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে অংশটা আছে, সে অংশটিই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অগ্রণী অংশ । কিন্তু এর বাইরেও একটা বড় অংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশ (হক, ১৯৯৯) এই অংশটি আমার গবেষণা এলাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যারা গ্রামের ছোট ও মাঝারি স্বচ্ছল কৃষক, দোকানদার নিম্ন ও মধ্য অবস্থার ব্যবসায়ী, মফস্বল শহর ও গ্রামবাসী স্কুল ও কলেজ শিক্ষক, ইত্যাদি। যারা নিম্নবর্গীয় ও শাসক শ্রেণীর মাঝামাঝিতে অবস্থান করে, আয়ের নির্দিষ্ট উৎস রয়েছে এবং কায়িক শ্রম যাদের জন্য বাধ্যতামূলক না।

৩. "মতাদর্শ বলতে বোঝায়, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ যা নির্দিষ্ট সামাজিক দল (উদাহরণস্বরুপ, নরবর্ণ, লিঙ্গ) কিংবা শ্রেণীর বৈশিষ্ট" (আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩)।

৪. খৃষ্ট ধর্মীয় যাজক থমাস ম্যালথাস জনসংখ্যা তত্ত্ব দিয়ে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য উৎপাদনের পরিমান বৃদ্ধির তুলনা করে এক ভীতি সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মানুষের সংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক হারে আর খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে গাণিতিক হারে। অর্থাৎ খাদ্য উৎপাদন মানুষের সংখ্যার তুলনায় অনেক পিছিয়ে থাকবে। যদি মানুষের বৃদ্ধির হার কমানো না যায় তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রণ ঘটবে অর্থাৎ মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, বিগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ সব আপদ এসে পড়বে। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বে বৃটেনের গরিব মানুষ সম্পর্কে যে ভীতি ছিল, এর প্রতিফলন ঘটে প্রায় ১৩১ বছর পর। ১৯৬৭ সালে মার্কিন পরিবেশ বিজ্ঞানী এহরলিক ও তার স্ত্রী এ্যানি এহরলিক জনসংখ্যা বোমা শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ভারতে জনসংখ্যা দেখে ভয় পেয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এরপর থেকে জনসংখ্যা বিষয়কে কেবল বোমার সাথে তুলনা করে আলোচনা হতে থাকে। নতুন আর এক ম্যালথাসের জন্ম হলো যুক্তরাষ্ট্রে (ইউভাল, ১৯৯৭ ও আখতার, ১৯৯৯)।

তথ্যসূত্র

Ahmed, Alia (1991) *Women in Fertility in Bangladesh.* India : Sage Publication, Pvt, Ltd

Akter, Farida (1992) *Depopulating Bangladesh.* Dhaka: Narigrantha Prabartona.

Akter, Farida (1995) *Resisting Norplant.* Dhaka: Narigrantha Prabartona.

Akter, Farida (2001) Donar driven family planning service in Bangladesh: Impact on women's health in *Public Health and Poverty of Reforms the South Asian Pridicament*, ed. Imrana Qadeer, Kasturi Sen and KR Nayar: New Delhi: Sage Publication.

Davids, Jennifer Phillips (2000) Weak Blood and Crowded bellies: Cultural Influences on Contraception Use Among Ethiopian Jewish Immigrants in Israel. In *Contraception Across cultures*, ed. Andrew Russell, Elisa J. Sobo, and Mary S. Thompson: Oxford (New York): Berg.

Greenwood, karen and Lucy, King (1981) Contraception and Abortion. In *Women in society*, ed. The Cambridge Women's Studies Group: London: Virago Limited Press. Page. 168-182.

Hartman, Betsy(1987) *Reproductive Rights and Wrongs: The Global Politics of Population Control and Contraceptive Choice.* Boston: South End Press.

Kalar, Amy (2000) Fertility running Wild: Elite perceptions of the need for Birth Control in White-Ruled Rhodesia. In *Contraception Across cultures*, ed. Andrew Russell, Elisa J. Sobo, and Mary S. Thompson: Oxford (New York): Berg.

Randeria, Shalini.(1998) *Through the Prism of Population: State Modernity and Body in India.* Research project MS(Unpublished)

Stark, Nancy (2000), My Body, My Problem: Contraceptive Decision -Making among Rural Bangladesh Women. In *Contraception Across Cultures*, ed. Andrew Russell, Elisa J Sobo and Mary S Thompson: Oxford: Berg.

White, Sarah C (1992), *Arguing with the Crocodile.* Dhaka: The University Press Limited.

Yuval, Nira (1997), *Gender and Nation.* New Delhi: Sage Publication

আখতার, ফরিদা (১৯৯৯) *'জনসংখ্যা'প্রসঙ্গ*, ঢাকা: নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা।

আখতার, ফরিদা (১৯৯৯) নারীর প্রজনন ক্ষমতাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের টার্গেট, *চিন্তা পত্রিকা* (সম্পা) ফরিদা আখতার, বছর -৮, সংখ্যা-৭, ঢাকা: নারীগ্রন্থ প্রর্বতনা

আখতার, ফরিদা. সীমু, সীমা দাস. বেগম, রোকেয়া ও আপেল, মীজানুর রহমান. (১৯৯৯) পাঁচ বছর মেয়াদী পদ্ধতি নরপ্ল্যান্ট, গ্রন্থ *মরলে খবর দিও* (সম্পা) ফরিদা আখতার, সীমা দাস সীমু, রোকেয়া বেগম ও মীজানুর রহমান আপেল, ঢাকা: নারীগ্রন্থ প্রর্বতনা।

আহমেদ, রেহনুমা ও চৌধুরী, মানস (২০০৩) *নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ: সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: একুশ পাবলিকেশন্স লিমিটেড।

ইসলাম, সাদাফ নূর-এ ও সুলতানা, মির্জা তাসলিমা (২০০২) নারীশরীরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দাপট: গর্ভকাল প্রসঙ্গে, গ্রন্থ *ইউ পি এল নির্বাচিত বাংলাদেশের প্রবন্ধ ২০০১* (সম্পা) মহিউদ্দিন আহমেদ, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

ইসলাম, সাদাফ নূর-এ ও সুলতানা, মির্জা তাসলিমা (২০০৬ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত State, Violence and Rights: Perspective from the social science শিরোনামে জাতীয় সেমিনারে পঠিত) *নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা: নারীবাদী দর্শনের সাম্প্রতিক সংকট ও উত্তরণ ভাবনা*, অপ্রকাশিত।

চৌধুরী, মানস এবং গুলরুখ, সায়দিয়া (২০০০) *এইডস ও যৌনতা নিয়ে ডিসকোর্স: রোগীর প্রান্তিকতা*, ঢাকা: রূপান্তর প্রকাশনা।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (১৯৯৮) নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস, গ্রন্থ *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (সম্পা) গৌতম ভদ্র, ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

মজহার, ফরহাদ (২০০০) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শ্রেণীভীতি ও বর্ণবাদ, *চিন্তা পত্রিকা* (সম্পা) ফরিদা আখতার, বছর-৯, সংখ্যা ৫-৬, ঢাকা: নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা।

হক, হাসান আজিজুল (১৯৯৯) বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত, গ্রন্থ *সংস্কৃতি* (সম্পা) বদরুদ্দীন উমর, ঢাকা।